ভূমিকা

ভূমিকা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রকরণগুলির মধ্যে উপন্যাস হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় প্রকরণ। উপন্যাস শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'নভেল', যা ইতালিয় শব্দ 'নভেলা' থেকে এসেছে। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে স্যামুয়েল রিচার্ডসনের 'পামেলা'কে (১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ) ধরা হয়। বাঙালিরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উপন্যাসের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ে এবং বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখার প্রয়াস করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কিছু শ্লেষ, ব্যঙ্গমূলক রচনা প্রকাশিত হয়। এই লেখাগুলি উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। এই সময় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথনাথ শর্মা ছদ্মনামে 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ) লেখেন। এখানে আমরা উপন্যাসের ক্ষীণ আভাস পাই। 'নববাবু বিলাস' রচনা ৩৫ বছর পর প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' রচিত হয়। এখানে শব্দ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য আদব-কায়দাকে অনুসরণ করা বাবু সম্প্রদায়ের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এর এক বছর পর ১৮৫৯ সালে প্যারীচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখা কি উপায়' প্রকাশিত হয়। এটিও নকশাধর্মী লেখা। এর পাশাপাশি কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থটিতে বাবুদের বাস্তব চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এছাড়া এসময় আরো বেশ কিছু লেখক উপন্যাস রচনার প্রয়াস করে যান। এদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, গোপীমোহন ঘোষ প্রমুখ অন্যতম। ভূদেব মুখোপাধ্যায় লেখেন 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'বিচিত্রবীর্য' (১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ) নামক একটি আখ্যায়িকা রচনা করেন এবং গোপীমোহন ঘোষ রচনা করেন 'বিজয়বল্লভ' (১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ)। তবে বলাবাহুল্য এগুলোর মধ্যে কোনটি উপন্যাস বলে গৃহীত হয় না। শুধুমাত্র প্যারীচাঁদ মিত্রের

'আলালের ঘরের দুলাল' সবচেয়ে বেশি উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত ও এই জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্যার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর উপন্যাস রচনার রীতি অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। স্যার ওয়াল্টার স্কট স্কটল্যান্ড –এর ইতিহাসকে আশ্রয় করে একের পর এক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের আশ্রয় নিয়ে একের পর এক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। যদিও তিনি একমাত্র 'রাজসিংহ' ছাড়া বাকি কোন উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে চাননি। তিনি ইতিহাসকে আশ্রয় করে লিখিত উপন্যাসগুলিকে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম— 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'সীতারাম', প্রভৃতি। এর পাশাপাশি তিনি কিছু দেশাত্মবোধক উপন্যাস রচনা করেছেন। যেমন- 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী'। এছাড়া তিনি একাধিক সমাজ-সমস্যামূলক উপন্যাস রচনা করেছেন। যেমন– বৃষবিক্ষ', 'ইন্দিরা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাধারানী'। এই পর্যায়ে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উৎকৃষ্ট রচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কালে একাধিক ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ রচনা করেন 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (প্রথম খন্ড ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ, দ্বিতীয় খন্ড ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩ - ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ) রচনা করেন 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ), 'হরিষে বিষাদ' (১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ), 'অদৃষ্ট' (১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের দাদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪ – ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ) রচনা করেন 'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ), 'মাধবীলতা' (১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ), 'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৭ – ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রথম

উপন্যাস ‘বঙ্গ বিজেতা’ (১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ) বাবরের আমলের ইতিহাস নিয়ে লেখা। এছাড়া তিনি ‘মাধবীকঙ্কন’ (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ), ‘মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত’ (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ), ‘রাজপুত জীবনসন্ধ্যা’ (১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ), ‘সংসার’ (১২৯৩ খ্রিস্টাব্দ), ‘সমাজ’ (১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেছেন। এছাড়া এই সময় নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রত্নোত্তমা’ (১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ), মীর মোশারফ হোসেনের ‘রত্নাবতী’ (১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ), ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চণ্ডালিনী’ (১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ), মদনমোহন মিত্রের ‘সমর সায়িনী’ (১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ), উমাচরণ চক্রবর্তীর ‘বসন্ত-কুমারী’ (১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ), শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘কাঞ্চনমালা’ (১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ), প্রভৃতি উপন্যাস রচিত হয়।

এরপর বাংলা সাহিত্যাকাশে রবির উদয় হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম উপন্যাস রচনার প্রয়াসে ‘করুণা’ (ভারতী পত্রিকায় আশ্বিন ১২৮৭ বঙ্গাব্দ থেকে ভাদ্র ১২৮৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত) রচনা করেন। এটি একটি অপরিণত লেখা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তীকালে এটিকে উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি হননি। ‘করুণা’কে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সার্থক উপন্যাস ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’ (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ)। ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’ (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ) ও ‘রাজর্ষি’ (১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ) অনেকটা বঙ্কিম প্রভাবে ইতিহাসের কাহিনি নিয়ে লেখা। তার ‘চোখের বালি’ (১৯০১ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের একটি অসামান্য সংযোজন। মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী, মা রাজলক্ষ্মীর মনের অন্তরালে টানাপোড়েন এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। এরপর ‘নৌকাডুবি’ (১৩১৩ বঙ্গাব্দ) লেখা হয়। এটি মূলত কাহিনি নির্ভর ঘটনাবহুল উপন্যাস। ১৯১০ সালে প্রকাশিত ‘গোরা’ একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস। ‘গোরা’ রচনার পর রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে ভাবগত আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ১৯১৬ সালে ‘চতুরঙ্গ’ ও ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হয়। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসটি জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস এই চারটি মূল চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক

উপন্যাস ও চলিত ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় নিখিলেশ, সন্দীপ ও বিমলার আকর্ষণ-বিকর্ষণের ত্রিকোণ কাহিনি এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সাহিত্য-সৃজনের মধ্য গগণে বিরাজমান তখন বাংলা সাহিত্যে আরেক প্রতিভাবান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) আবির্ভাব হয়। বাংলা সাহিত্যে তিনি জনপ্রিয়তম সাহিত্যিক। একসময় তাঁর জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথকেও ছাপিয়ে যায় বলে সমালোচকদের মত। তাঁর প্রথম 'মন্দিরা' গল্পটি কুন্তলীন পুরস্কার পাবার পর তাঁর লেখার প্রতি ঝোঁক আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ছোটগল্পের পাশাপাশি তিনি একাধিক উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম হল— 'বড়দিদি' (১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ), 'বিরাজ বউ' (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ), 'পরিনীতা' (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ), 'পণ্ডিত মশাই' (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ), 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ), 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ, দ্বিতীয় পর্ব ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ, তৃতীয় পর্ব ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ, চতুর্থ পর্ব ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ), 'দেবদাস' (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ), 'দত্তা' (১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ), 'গৃহদাহ' (১৯২০ খ্রিস্টাব্দ), 'দেনাপাওনা' (১৯২০ খ্রিস্টাব্দ), 'পথের দাবী' (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ), 'শুভদা' (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি। শরৎচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেকটি রচনা পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'শ্রীকান্ত'কে শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য করা হয়। এই উপন্যাসে অপরূপ প্রকৃতি বর্ণনা পাঠকসহ সমালোচক মহলকে মুগ্ধ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে সেই সময় রচিত প্রায় সমস্ত সাহিত্যকর্মে প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল। এই সময় কিছু তরুণ সাহিত্যিক রবীন্দ্র প্রভাব কাটিয়ে উঠতে মরিয়া প্রচেষ্টা করেন। তাঁদের এই

বিদ্রোহের সুর শোনা গিয়েছিল 'কল্লোল' (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ), 'কালি কলম' (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ), 'প্রগতি' (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ), 'সংহতি' (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) 'উত্তরা' (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ), 'বিচিত্রা' (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি পত্রিকায়। নতুন প্রজন্ম সবসময়ই নতুনত্ব চায়, তারা সব সময় বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন। আর তাঁদের প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নতুন যুগের সূচনা করে। এই সময়-কালকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে বলেছেন—

> "কল্লোল" বললেই বুঝতে পাড়ি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।"[১]

আর রবীন্দ্র বিরোধিতা করে উপরোক্ত পত্রিকায় যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেছিলেন তাঁদের আমরা কল্লোল যুগের সাহিত্যিক হিসেবে চিনি। কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্র-বলয় থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবমুখী মৃত্তিকাচারি সাহিত্য-জগৎ তৈরি করা। এই সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অবনীনাথ রায় প্রমুখ। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার বলেছেন—

> "আজকের দিনের যত নতুন লেখক আছে স্তব্ধ হয়ে, সবাইর ভাষাই ঐ "কল্লোল"। সৃষ্টির কল্লোল, স্বপ্নের কল্লোল, প্রাণের কল্লোল। বিধাতার আশীর্বাদে তাই সবাই একত্র হয়েছি। মিলেছি এক মানসতীর্থে। শুধু আমরা কজন নয়, আরো অনেক তীর্থংকর।"[২]

সমাজ বাস্তবতার নাম করে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা সাহিত্যে যথেচ্ছ অশ্লীলতা ও যৌনতার আমদানি করেছেন এই অভিযোগে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস, নীরদ চৌধুরী প্রমুখ কল্লোলগোষ্ঠীর

লেখকদের আক্রমণ চালাতে থাকেন। 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস 'কল্লোলের' লেখকদের অশ্লীলতা নিয়ে অভিযোগ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র লেখেন এবং এই সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চান—

> "আমি নিজে এগুলিকে সাহিত্যের আগাছা বলে মনে করি। বাঙলা সাহিত্যের যথার্থ রূপ নেবার পূর্ব্বেই এই ধরনের লেখার মোহে প'ড়ে নষ্ট হতে বসেছে, এই আমার ধারণা। সেই জন্য আপনার মতামতের জন্য আমি এই চিঠি দিচ্ছি।"[৩]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে তাঁর আবেদন খারিজ করে দেন। এই বিরোধিতা কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের বিদ্রোহের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্য ধারা পোক্ত জমি লাভ করে। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁরা সাহিত্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক সঙ্কটকে সাহিত্যে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এই সময় দেশে যে অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন দেখা গেছিল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখায় তার প্রতিফলন দেখা যায়। আর তাঁর সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ভবঘুরে মানুষের জীবন-দর্শনকে তুলে ধরা। এই সম্পর্কে সমালোচক সুদীপ্তা চক্রবর্তী বলেছেন—

> প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে, বিশেষত বিশ-তিরিশের দশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও এইদেশেও অর্থনৈতিক সংকট, মূল্যবোধের রূপান্তর, বোহেমীয় মানসিকতা ও প্রতিষ্ঠিত জীবনধারার ভাঙচুর—এইসব উপকরণেরই প্রতিফলন ঘটেছে অচিন্ত্যকুমারের কথাসাহিত্যে।"[৪]

তাঁদের লেখায় যৌন-চেতনার সাহসী পরিস্ফুটন লক্ষ করা যায়। এই সম্পর্কে সমালোচক ড. দেবকুমার বসু বলেছেন—

> "কল্লোলগোষ্ঠীর যে মূল বৈশিষ্ট্য সমাজ-চেতনা ও যৌনচেতনা ও যৌনবাস্তবতা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষেণ—সেই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় সংহতি, প্রগতি, কালিকলমের লেখকগোষ্ঠীর প্রকাশিত সাহিত্যে।"[৫]

এই কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মধ্যে আমরা নানা রকম সাহিত্য প্রতিভার উপস্থিতি লক্ষ করি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সর্বমোট বিয়াল্লিশটি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলিতে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। তবে তিনি তাঁর উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের জটিলতাকে সবসময় গুরুত্ব দিয়েছেন। আলোচ্য গবেষণা কর্মে তাঁর উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের জটিলতা অন্বেষণে আমি নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভাজন করেছি—

প্রথম অধ্যায়	:	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সময়কাল, আত্মকথা ও রচনাসম্ভার।
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসের প্রাথমিক পরিচয় ও বিষয়গত বিভাজন।
তৃতীয় অধ্যায়	:	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা অন্বেষণ।
চতুর্থ অধ্যায়	:	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসে পরকীয় সম্পর্কের জটিলতা অন্বেষণ।
পঞ্চম অধ্যায়	:	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসে অবিবাহিত নর-নারীর প্রেমের টানাপোড়েন অন্বেষণ।
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের জটিলতায় কল্লোলের কালের প্রভাব ও স্বাতন্ত্র্য বিচার।

আমি উক্ত অধ্যায়গুলির শিরোনামের দিকে লক্ষ রেখে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসগুলি আলোচনায় অগ্রসর হব। আমার গবেষণাকর্মটির মাধ্যমে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমি পরবর্তী অধ্যায়গুলির মাধ্যমে ঔপন্যাসিক কীভাবে তাঁর উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের জটিলতাকে তুলে ধরেছেন তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব।

তথ্যসূত্র:

১) কল্লোল যুগ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা- ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৭, পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৫৮, পৃষ্ঠা- ৩০

২) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৭

৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৭

৪) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কবি ও কথাশিল্পী : সুদীপ্তা চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- ১ বৈশাখ, ১৪২০, পৃষ্ঠা- ১২০

৫) কল্লোলগোষ্ঠীর কথাসাহিত্য : ড. দেবকুমার বসু, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৩৮৭/১৯৮০, দ্বিতীয় করুণা সংস্করণ : আগষ্ট, ২০০৮, পৃষ্ঠা- ২১